Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 124-132
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.089

পরিবেশ ও নৈতিকতা: একটি দার্শনিক অনুসন্ধান

সামিরুল ইসলাম, *স্বাধীন গবেষক, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.04.2026; Accepted: 24.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The environmental crisis represents a significant danger to the continued existence of human being. Challenges such as climate change, decline of biodiversity, pollution, greenhouse effect, decline of ozone layer, and excessive use of natural resources have increased this worldwide issue. This paper presents a philosophical exploration of the connection between environment and ethics, investigate how human behavior towards nature is rooted in morality. In particular, the relationship between humans and nature is re-evaluate in light of various moral theories such as anthropocentrism, biocentrism, ecocentrism, and deep ecology.

The research contends that environmental issues are not only solely scientific or technological obstacles but are fundamentally ethical and value driven concern. Furthermore, it understood the importance of Indian philosophical tradition, which emphasize harmony, non-violence, and respect for nature, as a crucial basis for environmental ethics and also western tradition.

The study concludes that a comprehensive ethical framework is crucial for tackling environmental emergencies— one that acknowledges both human requirements and the inherent worth of nature, while also fostering accountability for future generations.

Keywords: Environmental ethics, Non-Anthropocentrism, Anthropocentrism, Biocentrism, Ecocentrism.

ভূমিকা:

আমরা মানুষ, আমরা পরিবেশে বসবাস করি, পরিবেশ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। পরিবেশ হল মূলত গাছ-পালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, মাটি, জল, বাতাস, নদী-নালা, খাল-বিল, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, বনাঞ্চল, দিন-রাত্রির আবর্তন, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদির এক সমগ্রতা, আর এই সমগ্রতাকে আমরা পরিবেশ বলি। আর নীতিবিদ্যা হলো মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান, যা মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বিচার করে। পরিবেশের সমস্ত কিছু পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল আর এই নির্ভরশীলতাকে ecology বা বাস্তুসংহতি বলা হয়, কিন্তু বর্তমানে পরিবেশের বিভিন্ন সংকট মানব অস্তিত্বের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বনাঞ্চল ধ্বংস করে শিল্পায়ন, নগরায়ন, অতিরিক্ত ভোগবাদ এবং প্রযুক্তির অপব্যবহার পরিবেশের বাস্তুসংহতি অর্থাৎ ভারসাম্যতা বা নির্ভরশীলতাকে নষ্ট করে চলেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের অযথা ব্যবহার করার ফলে আজ শুধু মানুষের জীবনই বিপদে পরেনি, বরং সমগ্র জীবকুলও বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

স্বার্থপর ও লোভী মানুষ প্রকৃতির অপরিমেয় ও অতুলনীয় সম্পদ অপচয় করে মানবজাতিসহ সমগ্র জীবমণ্ডলের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। পৃথিবীর জল, মাটি, বায়ুস্তর, উষ্ণতার মাত্রা, সুরক্ষিত না থাকলে বৃক্ষ-তরুলতা বিপন্ন হয়, বৃক্ষ-তরুলতা বিপন্ন হলে পশু-পাখিরা বিপন্ন হয়, এবং পশু-পাখি বিপন্ন হলে মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলে জীববৈচিত্র্যেভরা শস্যশ্যামলা পৃথিবী একদিন বন্ধ্যা পৃথিবীতে পরিণত হবে।[i]

মানুষ প্রকৃতির উপর অধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে এবং নিজেকে প্রকৃতির কেন্দ্রবিন্দু মনে করছে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশ ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ। পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে সম্প্রতি ২০০৭ সালে "ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ" এর প্রতিবেদনে বিশ্বের সকল মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যথায়, এই শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যে মেরুঅঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার ফলে অনেক দেশ জলমগ্ন হয়ে যাবে, অনেক অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবে এবং পৃথিবী ক্রমশই প্রাণহীন উপগ্রহে পরিণত হবে।[ii] এই সমস্যাগুলো কেবল বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক নয়; এগুলো মূলত নৈতিক সংকট। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে, পরিবেশ সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি এবং পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের জন্য নৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দার্শনিক বিতর্ক:

প্রাশ্চাত্য ঐতিহ্যে পরিবেশ ভাবনা:

প্রাশ্চাত্য দর্শন ভাবধারা অনুসারে মানুষই সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। প্রকৃতিকে কেবল মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উপাদান হিসেবে দেখা হয়। ইহুদি চিন্তা ও গ্রিক দর্শনে মানুষকেই এই জগতের কেন্দ্ররূপে গণ্য করা হয়েছে। old testament-এর সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে : "ঈশ্বর তার নিজের মানসপুত্র মানুষকে সৃষ্টি করে সেই মানুষের উপর জগতের আধিপত্য অর্পণ করেন। জলজীব মাছের উপর আধিপত্য, নভচর পাখির উপর আধিপত্য, বিচরণশীল সমস্ত স্থল জীবের উপর আধিপত্য। এক কথায় সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য। ঈশ্বরের অভিপ্রায় হল জলজীব, মাছ, নভচর পাখি এবং বিচরণশীল সমস্ত প্রাণী তাদের অধিপতিরূপে মানুষকে যেন ভয় করে মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে"।[iii] মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ধর্মযাজক St. Augustine পশু হত্যা ও বৃক্ষছেদনকে অন্যায় বলেননি।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে একই মতামত প্রকাশ করে বলেছেন যে মানুষের প্রয়োজনেই জড়জগৎ এবং জীবজগৎ। মানুষের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে এই জড়জগৎ ও জীবজগতের বিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ, সবকিছুই মানুষের প্রয়োজন পূরণকারীরূপে বিবর্তিত হয়েছে। ইহুদিদের এবং অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন যে মানুষ কেবল তার স্রষ্টা ঈশ্বর এবং প্রতিবেশী মানুষের কাছে দায়বদ্ধ, মানবাতীত প্রাণীদের প্রতি কোন দায়িত্ব নেই। ঈশ্বরের বিধান ভঙ্গ করা পাপ হলেও, প্রতিবেশী মানুষের ক্ষতি করা পাপ হলেও, মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে গাছপালা নষ্ট করতে পারে, পশুহত্যা করতে পারে, কারণ তাদের প্রতি মানুষের কোন দায়িত্ব না থাকার ফলে সেসব পাপের অন্তর্গত নয়। ন্যায়-অন্যায়ের কাঠামোর কেন্দ্রে মানুষ এবং মানুষের সমাজ রয়েছে। মানুষের জীবনই কেবলমাত্র নিজের মূল্যবান, তবে পশু হত্যা বা বনানী ধ্বংস যদি মানুষের প্রয়োজনের ক্ষতি করে বা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে, তাহলে সেসব অযৌক্তিক এবং অনুচিত কাজ হবে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা প্রয়োজনের তাগিদে গাছ কাটার এবং পশু হত্যাকে সমর্থন করলেও, তারা অবাধে গাছ কাটা এবং পশু হত্যা করতে উৎসাহী নন এবং পরিবেশ দূষণের বিষয়েও সতর্ক থাকেন। মানুষের উচিত প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে মানুষের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন না হয়। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন যে সারা জগত, ভূতাত্ত্বিক, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ

মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য গঠিত হলেও মানুষ যেন তাদের উপর সঠিকভাবে আধিক্য স্থাপন করে এবং ভোগ করে, যাতে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়। তাই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা পরিবেশ রক্ষাকে অবমূল্যায়ন করেন না।

ভারতীয় ঐতিহ্যে পরিবেশ ভাবনা:

ক. উপনিষদীয় অভিমত:

পাশ্চাত্যের ইহুদি এবং প্রাচীন গ্রিক দর্শন অনুযায়ী কেবল মানবজীবনই মূল্যবান। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে জগতের প্রতিটি উপাদানই মূল্যবান। কারণ, সবকিছুই আনন্দের আকারে বাহিত হয়। পাশ্চাত্যের চিন্তন বস্তুগত, ভারতীয় চিন্তন আধ্যাত্মিক। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মতে, জগতের সকল কিছু—জড় এবং অজড়—মূল্যবান। কারণ, এগুলো সবই আনন্দের রূপ আত্মা বা ব্রহ্মের প্রকাশ। উপনিষদের ঋষি বলেছেন----

"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ণ সন্তোষধী।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুবৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাং অস্ত সূর্যঃ । ঋক্ সংহিতা । ১/৯০

অর্থাৎ, 'সমগ্র বিশ্বভূবন সেই আনন্দস্বরূপ একের (ব্রহ্ম বা আত্মার) প্রকাশ রূপে নিজগুনে মধুময়- বাতাস মধু বহন করে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করে, বনস্পতি মধু সঞ্চয় করে; রাত্রি, ঊষা, পৃথিবীর ধূলিকণা, সূর্য মধুময় হোক'। মানুষের জীবনে যে মধুময় আনন্দের প্রকাশ, সমগ্র জগতে তারই প্রকাশ উপলব্ধ হোক, জগতের প্রতিটি বস্তুর স্বতঃমূল্য উপলব্ধ হোক, জীব-অজীব প্রত্যেকের সঙ্গে আত্মিক যোগ উপলব্ধ হোক"।[iv]

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মতে, একজন সত্যিকারের ধার্মিক ও নৈতিক ব্যক্তির কাছে প্রাণ তার নিজ গুণে বিশুদ্ধ ও মূল্যবান, এবং এজন্য প্রাণশক্তি বা চৈতন্যময় প্রতিটি বস্তুর রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের জীবনে অপরিহার্য পবিত্র কর্তব্য। ভারতীয় ঋষি বলেন-

'বৃক্ষাদীরও প্রাণ আছে, সুখ দুঃখ বোধ আছে'।[v] - এদের আত্মজ্ঞানে লালন কর, পালন কর।

'মঙ্গলকামী ব্যক্তি মাত্রই বৃক্ষ রোপণ করবেন এবং পুত্র স্নেহে তাদের লালন পালন করবেন'[vi]।

'বৃক্ষছেদন, প্রাণীহত্যা ও রক্তপাত ঘটিয়ে স্বর্গ লাভ হয় না, তা নরকের পথে প্রশস্ত করে'[vii]। যেকোন হিংসাত্মক কর্ম অনুচিত কর্ম।

পরিবেশের বাস্তুসংহতি প্রসঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারাকে ব্যক্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন-

"ওঁ ভূর্ভবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনং প্রচোদয়াৎ"।

'একদিকে ভুলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্ক লোক আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের চেতনা এই দুইকে নিয়েই যার এক শান্তি বিকর্ণ করছে এই দুইকেই যার আনন্দ যুক্ত করছে তাকে তার এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী'[viii]। গায়ত্রী মন্ত্র হচ্ছে, বিশ্বের সবার যুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞানে তাদের সংরক্ষণ মন্ত্র।

খ. জৈন অভিমত:

জৈনধর্ম একটি ব্যাপক ধর্ম ও দর্শন, যার উৎপত্তি প্রাচীন ভারতে। এর আধ্যাত্মিক ধারা প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের মাধ্যমে শুরু হয়ে ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীরের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। পার্শ্বনাথের শিক্ষাই এর ভিত্তিগত নীতি হিসেবে কাজ করে, যা পরবর্তীকালে মহাবীর পরিমার্জিত ও প্রসারিত করে জৈনধর্মের মূল মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই

ধর্মের প্রধান লক্ষ্য হলো জাগতিক আসক্তি ও কর্মবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি (মোক্ষ) লাভ করা। জৈন ধর্ম ও দর্শনে পঞ্চব্রতের কথা বলা হয়েছে, অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য-অপরিগ্রহ। অহিংসা ব্রতই হল মুখ্য, অপর চারটি ব্রত অহিংসা ব্রতেরই অঙ্গস্বরূপ। অহিংসার সার কথা হলো-

'ন হন্যেত ন ঘাতয়েত'।

-"হনন করবে না, হননের কারণ হবে না, কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে কোন জীবের ক্ষতি না করা, ক্ষতির চিন্তা না করাই অহিংসা। নিজে হিংসা করা, অপরকে দিয়ে হিংসা করানো, অপরের হিংসাত্মক কর্ম সমর্থন করা সবই হিংসার অন্তর্গত"।[ix] জৈনরা বিশ্বাস করেন যে অহিংসা বা অহিংসা কেবল একটি বিচ্ছিন্ন নৈতিক নিয়ম নয়, বরং এটি একটি মৌলিক নীতি যা তাদের মুক্তি বা মোক্ষ লাভের পথ দেখায়। তারা অহিংসা চর্চাকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অর্জনের একটি উপায় হিসেবে দেখেন এবং একই সাথে পরিবেশ ও সকল জীবজন্তু রক্ষায় এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও স্বীকার করেন। ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীরের শিক্ষায় করুণা ও অহিংসার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা জৈনধর্মকে একটি অত্যন্ত নৈতিক ধর্মে পরিণত করেছে। এটি অনুসারীদের দয়া ও পবিত্রতার মতো অভ্যন্তরীণ গুণাবলী বিকাশে উৎসাহিত করে এবং বাহ্যিকভাবে এমন কাজে নিযুক্ত হতে বলে যা পরিবেশের স্থায়িত্ব এবং পৃথিবীর সকল জীবের কল্যাণে সহায়ক।

গ. বৌদ্ধ অভিমত:

বৌদ্ধধর্মে, ধর্মের ধারণাটি মৌলিকভাবে নৈতিক আচরণের সাথে যুক্ত, যা অহিংসার উপর জোর দেয় এবং জাগতিক ও জীবজগতের উভয়ের সাথেই সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ অহিংসাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং এটিকে পরম নৈতিক নীতি হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের এমন সৎকর্মে নিযুক্ত হতে উৎসাহিত করতেন যা সকল প্রাণীর কল্যাণ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রীতিকে প্রাধান্য দেয়। বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত ধর্মীয় অনুশীলনের মধ্যে অহিংসা এবং করুণাময় কর্মের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা অন্তর্ভুক্ত, এবং তিনি গাছ কাটা ও পশু বলিদানের মতো কাজকে স্পষ্টভাবে নিন্দা করেছিলেন। তিনি আনন্দের জন্য বা বিদ্বেষপূর্ণ অভিপ্রায়ে হত্যা করাকে অন্যায় এবং নৈতিকভাবে ভুল বলে মনে করতেন। বুদ্ধের শিক্ষা অনুসারে, মুক্তি ও জ্ঞানলাভের লক্ষ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে—দেহ, বাক্য এবং মন—অহিংস আচরণের অনুশীলন করতে হবে। এই পথটি বিশ্বজনীন প্রেম ও করুণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যাকে প্রায়শই ব্রহ্মবিহার বলা হয়, যা ব্যক্তিকে পরম সত্তা ব্রহ্মের সাথে পরমানন্দ, ঐক্য এবং সম্প্রীতির অবস্থায় বাস করতে উৎসাহিত করে। এইরূপ গুণাবলীর চর্চার মাধ্যমে সাধকগণ হিংসাকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করতে পারেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এক করুণাময় ও শান্তিপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে পারেন। "বুদ্ধদেব বলেন যার ভাবনা এই প্রকারে বিশ্বভুবনের প্রতিটি বস্তুতে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে বিহার বা ভ্রমণ করে, তিনি শয়নে ও জাগরণে এমন মঙ্গল চিন্তায় বা ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন-

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু– সব জীব সুখী হোক।
অবেরা হোন্তু- জীব মাত্রই শত্রুহীন হোক।
অব্যাজঝা হোন্তু- সবাই হিংসামুক্ত হোক।
সুখী আত্মানং পরিহরন্তু- সব জীব সুখী আত্মারূপে জীবন যাপন করুক।

সবে সত্তা মা যথলব্ধসম্পত্তিতো বিগছন্তু- কোন জীব তার ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।
বুদ্ধদেবের এমন চিন্তা বা ভাবনার মধ্যে বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের পূর্বাভাসটি সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটে হয়েছে"।[x]

বুদ্ধের পঞ্চশীল ব্যক্তিগত সততা ও নৈতিক আচরণের বিকাশের লক্ষ্যে পথনির্দেশক নীতি হিসেবে কাজ করে, যা মোক্ষ লাভের জন্য অপরিহার্য। এছাড়াও, এই শীলগুলো পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্বের উপর জোর দেয় এবং মানব আচরণ ও প্রাকৃতিক জগতের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ককে তুলে ধরে। এটি বুদ্ধের এই গভীর উপলব্ধিকে প্রতিফলিত করে যে, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং নৈতিক শৃঙ্খলা লালন করার মাধ্যমেই স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয়। "পঞ্চশীলের মাধ্যমে বুদ্ধদেব প্রকৃতির এই ভারসাম্য ব্যবস্থার সংরক্ষণের প্রতি আলোকপাত করেছেন। বুদ্ধ প্রবর্তিত পঞ্চশীল হল-

১. পানং নহনে - প্রাণী হত্যা করবে না, সব জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করবে।
২. ন চ আদিন্নমাদিয়ে - তোমাকে যা দেয়া হয়নি তা গ্রহণ করবে না, লোভবশত পরাধন গ্রহণ করবে না, যা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য নয় তা তোমার গ্রহণীয় নয়।
৩. মুসা না ভাসে - মিথ্যা কথা বলবে না, কেননা মিথ্যা কথা বলার অর্থ অপরকে প্রবঞ্চনা করা।
৪. ন চ ন মজ্জপো সিয়া - চিত্তশুদ্ধি রক্ষার্থে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করবে না, অর্থাৎ মদ খাবে না।
৫. ব্রহ্মচারিয়ঞ্চ মঙ্গলমুত্তম - কামেচ্ছাকে দমন করবে, কেননা তাতেই মঙ্গল"।[xi]

এছাড়া গৌতম বুদ্ধ মৈত্রীভাবনার (সকল জীবের প্রতি মঙ্গল চিন্তায় নিয়োজিত থাকাই হলো মৈত্রী ভাবনা) দ্বারা জীবজগতের সেবায় মানুষকে নিয়োজিত হতে বলেছেন, কেননা তাতেই জগতের সার্বিক মঙ্গল। সুতরাং বুদ্ধদেবের অহিংসাসম্মত মৈত্রীভাবনা পরিবেশকে সুরক্ষিত রেখে সমগ্র জীবজগতের মঙ্গল সাধন করেছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভবিষ্যৎপ্রজন্ম:- মানবকেন্দ্রিক মতবাদ (Anthropocentrism):

প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে জীবজগৎ উদ্ভিদজগৎ ও জড়জগতের সমগ্রতাকে বোঝায়। পরিবেশের উপাদানগুলি একে অপরের উপর নির্ভরশীল এই নির্ভরশীলতাকে বাস্তুসংহতি বলা হয়। যে মতবাদ অনুসারে কেবল মানুষের জীবনকে স্বতঃমূল্যবান বলা হয়, তাকে মানবকেন্দ্রিক মতবাদ বলা হয়। অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের মূল্য অনেক বেশি। মানুষের জীবন একমাত্র স্বতঃমূল্যবান, অন্য প্রাণীর নয়। পশুপক্ষী, উদ্ভিদ ইত্যাদির মূল্য পরকীয়, মানুষের ভোগের জন্য তারা মূল্যবান।

সমগ্র জীবকুলের মধ্যে মানুষই একমাত্র বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন জীব, তাই মানুষেরই দায়িত্ব এই প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করা। কিন্তু বর্তমানে কিছু লোভী ও স্বার্থপর মানুষ নিজেদের স্বার্থের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিনিয়ত নষ্ট করে চলেছে। বনাঞ্চলটি ধ্বংস করলে মানুষের কিছু স্বল্পমেয়াদী লাভ হতে পারে যেমন কিছু কর্মসংস্থান হবে, ব্যবসায়িক মুনাফা হবে, যার ফলে দেশের সামরিক অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল মানুষের স্বার্থে প্রাকৃতিক পরিবেশ কি নষ্ট করা সংগত হবে? মানুষের ব্যবসায়িক প্রয়োজন সাধনের জন্য পরিবেশ ধ্বংস করা কি ন্যায় সঙ্গত হবে? মানুষের স্বল্পমেয়াদী কিছু লাভের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আজকাল নীতিনির্ধারকেরা ভবিষ্যতের কথা না ভেবে শুধু নিজেদের সুবিধা দেখেন। এখনকার রাজনীতিকেরা আগামী নির্বাচন ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না।

মানুষ কোনো বিচার বিবেচনা না করে, ভবিষ্যতের কথা না ভেবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভালো-মন্দ না ভেবে, শুধুমাত্র অল্প সময়ের আনন্দের জন্য পরিবেশের ও প্রকৃতির জিনিসপত্র নষ্ট করে দিচ্ছে। মানুষ শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য আনন্দ পাওয়ার জন্য পরিবেশে গ্রীনহাউস গ্যাস বাড়িয়ে দিচ্ছে, সবসময় গাড়ি ও কলকারখানা বৃদ্ধি করছে, যার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েই যাচ্ছে।

আমরা সবাই জানি যে, এই বিশ্বপ্রকৃতিতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার ধ্বংসও অনিবার্য। তাই, প্রাকৃতিক নিয়মেই এই পৃথিবীতে যেমন প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, তেমনই এক সময় প্রকৃতির নিয়মেই পৃথিবী জীবশূন্য হয়ে

যাবে। আসল সমস্যা হলো, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা না ভেবে শুধুমাত্র বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নিজের খেয়ালখুশি মতো পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করলে, খুবদ্রুতই এই পৃথিবী থেকে জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করেছেন এবং তা সংরক্ষণ করেছেন, তেমনই আমাদেরও উচিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে এই পরিবেশকে রক্ষা করা। অল্প কিছু লাভের জন্য আমরা যেন এমন কিছু না করি যাতে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হয়ে যায়। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার বিচারে, শুধুমাত্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করা এবং পরিবেশ দূষিত করা অন্যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মঙ্গলের জন্য পরিবেশের সংরক্ষণ করাই হলো ন্যায়সঙ্গত কাজ। ব্যবহারিক নীতিবিদায় মানুষের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরিবেশ সুরক্ষার উল্লেখ করা হয় বলে এজাতীয় অভিমতকে বলা হয় মানবকেন্দ্রিক মতবাদ (Anthropocentric View)।

জীবকেন্দ্রিক মতবাদ (Biocentrism):

সমগ্র জীবমন্ডলকে কেন্দ্র করে যে মতবাদ সেই মতবাদকে বলা হয় জীবকেন্দ্রিক মতবাদ। আর সমগ্র জীবমন্ডল বা প্রাণীজগতকে কেন্দ্র করে যে নৈতিক মতবাদ, সেই মতবাদকে বলা হয় প্রাণীকেন্দ্রিক নৈতিক মতবাদ। মানবকেন্দ্রিক মতবাদে কেবলমাত্র মানুষের অস্তিত্বের রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে পরিবেশ সংরক্ষণ কি শুধু মানুষের দীর্ঘকালীন মেয়াদের জন্য মূল্যবান? মানুষ ভিন্ন প্রাণী অর্থাৎ মানুষ্যেতর প্রাণীর কি কোন মূল্য নেই? মানবকেন্দ্রিক মতবাদে মানুষ ভিন্ন প্রাণী অর্থাৎ মানুষ্যেতর প্রাণীর মূল্যকে পরকীয় বলা হয়েছে। মানুষের ভোগের জন্য তারা মূল্যবান।

ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্রে, সুখ বা আনন্দকেই একমাত্র স্বতঃ-মূল্যবান হিসেবে ধরা হয়। বেশিরভাগ মানুষের কাছে সুখ বা আনন্দই সবচেয়ে বেশি কাম্য। মানুষ টাকা-পয়সা চায় সুখ পাওয়ার একটা উপায় হিসেবে, কিন্তু সুখ চায় শুধুমাত্র সুখের জন্যই। কোনো বনবাসী সন্ন্যাসীর কাছে টাকার কোনো দাম না থাকলেও সুখের দাম কিন্তু কমে না। অনুভূতিপ্রবণ প্রাণীর জীবনে শারীরিক সুখ নিজের মূল্যেই মূল্যবান, আর খাবার, জল ইত্যাদির দাম হচ্ছে পরকীয়, কারণ এগুলো সুখ পাওয়ার উপায় হিসেবে কাজে লাগে। তাই, মানুষ এবং অনুভূতিপ্রবণ প্রাণীর জীবনে সুখ বা আনন্দের সুরক্ষার জন্য পরিবেশ রক্ষা করা দরকার। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় এখানে মানুষের সঙ্গে পশুদের জীবনের স্বকীয়মূল্যকে যোগ করে পরিবেশ সুরক্ষার কথা বলা হয় বলে এই প্রকার আলোচনাকে অমানবকেন্দ্রিক (Non-Anthropocentric) মতবাদ বলা হয়।

পরিবেশকেন্দ্রিক বা বাস্তুকেন্দ্রিক মতবাদ (Ecocentrism):

প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়েছে জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও জড়জগতের সমন্বয়ে। মানবকেন্দ্রিকতাবাদে মানুষকে মুখ্য প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং জীবকেন্দ্রিকতাবাদে সমগ্র জীবমণ্ডলকে মুখ্য প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল পরিবেশ কি শুধুমাত্র জীবজগতকে নিয়ে গঠিত? উদ্ভিদজগৎ ও জড়জগৎ কি পরিবেশের আওতায় আসে না? পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদ বা বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ বিশ্বাস করে যে জগতের প্রত্যেকটি উপাদান জৈব (মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ) এবং অজৈব (মাটি, জল, বাতাস, পাহাড়, পর্বত) পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এখানে নৈতিক গুরুত্ব কেবলমাত্র মানুষের (মানবকেন্দ্রিকতাবাদ) এবং জীবন্ত প্রাণীর (জীবকেন্দ্রিকতাবাদ) মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র প্রকৃতি একটি অখন্ড সত্তা হিসেবে মূল্যবান। কারণ জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও জড়জগৎ সবই একই পরিবেশের অঙ্গ।

বনভূমি রক্ষা করা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জরুরি। কারণ, এটি আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাসকে পরিষ্কার করে। পশুদের রক্ষার জন্যও বনভূমি দরকার, কেননা এটি তাদের বসবাসের স্থান। এতে বোঝা যায়,

পুরো উদ্ভিদজগতকে একটা লক্ষ্য পূরণের উপায় হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, মানুষ ও অনুভূতিপ্রবণ প্রাণীদের জীবনের মতো উদ্ভিদের জীবনকেও মূল্যবান মনে করে কি বলা যায় যে গাছ ধ্বংস করা ভুল কাজ? অনেকেই মনে করেন, এই পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যেই প্রাণ আছে। তাই মানুষ, পশু, গাছ, নদী সবকিছুকেই সম্মান করে রক্ষা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আলবার্ট শোয়েৎজার বলেছেন-

'জগতকে চৈতন্যময়' রূপে গণ্য করাই হল সত্যকার দর্শনের বৈশিষ্ট্য। জড়-অজড় জগতের সবকিছুর অনুচ্চারিত বাণী হল- 'বেঁচে থাকার কামনা নিয়েই আমি অনেকের মধ্যে বেঁচে আছি। আমার প্রাণের স্বভাবধর্মে আমি যেমন দীর্ঘায়ু কামনা করি, বেঁচে থাকার সুখ কামনা করি, আমার চারপাশের জগতের প্রতিটি বস্তু তাদের বেঁচে প্রাণের স্বভানধর্মে দীর্ঘায়ু ও বেঁচে থাকার সুখ কামনা করে'- যদিও ওইসব কামনা নিরব অনুচ্চারিত।[xii] প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারাতেও অনুরূপ অভিমত উল্লেখ আছে-

> 'বৃক্ষাদিরও প্রাণ আছে, সুখ-দুঃখবোধ আছে'।[xiii]
>
> 'মঙ্গলগামী ব্যক্তি মাত্রই বৃক্ষরোপণ করবেন এবং তাদের পুত্রস্নেহে পালন করবেন'।[xiv]
>
> 'বৃক্ষচ্ছেদন, প্রাণীহত্যা ও রক্তপাত ঘটিয়ে স্বর্গ লাভ হয় না, তা নরকের পথকে প্রশস্ত করে'।[xv]

'আত্মা সর্বব্যাপী', দ্যুলোকে সূর্যের মধ্যে, অন্তরীক্ষে বায়ুর মধ্যে, কলসের পানীয়ে, অগ্নিতে, মানুষে, জ্যোতিঃপুঞ্জে, জলজবস্তুতে, ওষধি বৃক্ষে, কর্মযজ্ঞের উপকরণে, পার্বত্যবস্তুতে, নদ-নদীর মধ্যে, সর্বত্রই এক আত্মা বিরাজমান'।[xvi] 'পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, জলরাশি, ওষধি, বনস্পতি, হিংসামুক্ত হোক'।[xvii]
ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার এই অভিমতটিকেও অর্থাৎ উদ্ভিদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন মতবাদটিকেও অমানবকেন্দ্রিক মতবাদ (Non-Anthropocentric) রূপে গণ্য করা হয়।

পরিবেশ নৈতিকতার ধারণা:

পরিবেশগত নৈতিকতা হলো ফলিত নীতিবিদ্যার একটি শাখা। পরিবেশগত নৈতিকতা বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের নৈতিক বিচার নিয়ে আলোচনা করা। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে কেমন আচরণ করবে এবং প্রকৃতির প্রতি তার কী কী দায়বদ্ধতা রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে, আর এই প্রকার নৈতিকতাকে পরিবেশ কেন্দ্রিক নৈতিকতা বলা হয়। পরিবেশগত নৈতিকতায় শুধুমাত্র মানুষের স্বার্থের কথা বলা হয় না, বরং সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষার কথা বলা হয়। এই নৈতিকতা মানুষকে প্রয়োজন ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন এর মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায় এবং অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে উৎসাহিত করে। তাই, পরিবেশগত নৈতিকতার মূল কথা হলো, শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা বা বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করা অন্যায় ও অনুচিত, যদি না তা একান্ত প্রয়োজন হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে, ব্যক্তি যখন নিজের স্বল্পকালীন স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে পরিবেশের সুরক্ষা করে, তখন সেটি ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপসংহার:

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে এখনকার পরিবেশগত সমস্যা শুধুমাত্র বিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তির বিষয় নয়, এটি আসলে একটি গভীর নৈতিক সমস্যা। মানুষের অতিরিক্ত ভোগ করার মানসিকতা, প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব ফলানো, নিজেকে পরিবেশের মালিক ভাবা এবং ভবিষ্যৎ না ভেবে শুধুমাত্র উন্নয়নের কথা চিন্তা করার কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে, যা বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করেছে।

এই প্রবন্ধে আলোচিত মানবকেন্দরিকতাবাদ, জীবকেন্দ্রিকতাবাদ এবং পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদ এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে পরিবেশকেন্দ্রিকতাবাদ আমাদের শেখায় যে, মানুষ সমগ্র প্রকৃতির একটা অংশ এবং সমগ্র পরিবেশব্যবস্থার সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

এছাড়া ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে যে সহাবস্থান, সাম্য ও অহিংসার ধারণা বিদ্যমান তা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য একটি শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে। এই মূল্যবোধগুলো বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

সুতরাং, পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য শুধুমাত্র আইন বা কারিগরি উন্নতি যথেষ্ট নয়, এর জন্য দরকার একটি গভীর নৈতিক বোধের উন্মেষ। মানুষের উচিত প্রকৃতিকে শুধুমাত্র ব্যবহারের জিনিস হিসেবে না দেখে সম্মান ও একত্রে বসবাসের ধারণা পোষণ করা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দায়বদ্ধতা এবং প্রকৃতির ভেতরের মূল্যকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে একটি ন্যায়পূর্ণ পৃথিবী তৈরি করা। মানুষের অতিরিক্ত চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা যাতে প্রকৃতির সামঞ্জস্য নষ্ট না করে, সেই কারণে পরিবেশ বিষয়ক নৈতিকতার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া উচিত। আজ প্রায় সব দেশেই ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য পাঠ্য তালিকায় পরিবেশমূলক বিজ্ঞান (Environmental Science) আবশ্য পাঠ্যরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

[i] ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ২০২২। পৃ. ২৪২।

[ii] তদেব পৃ. ২৪৩ ।

[iii] তদেব পৃ. ২৪৪ ।

[iv] তদেব পৃ. ২৭২ ।

[v] অন্তসংজ্ঞা ভাবন্যতে সুখ দুঃখ সমন্বিতা। - মনুসংহিতা। ১।৪৯

[vi] তস্লাৎ সুবহবো বৃক্ষা রোপ্যঃ শ্রেয়োহভিবাঞ্ছতা ।
পূত্রবৎ পরিপাল্যাশ্চ তো পুত্রা ধর্মতঃ স্মৃতাঃ - অগ্নিপুরাণ

[vii] বৃক্ষাংশ্চিত্ত্বা পশূন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দমম্।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গে নরকং কেন গম্যতে।। -পঞ্চতন্ত্র-কাকোলুকীয়ম্ ১০৬

[viii] শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্র রচনাবলী। দ্বাদশ খন্ড- পৃ. ৩০৫। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ।

[ix] ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ২০২২। পৃ. ২৭৬।

[x] ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ২০২২। পৃ. ২৮২।

[xi] তদেব পৃ. ২৮৩ ।

[xii] তদেব পৃ. ২৫২ ।

[xiii] অন্তসংজ্ঞা ভাবন্যতে সুখ দুঃখ সমন্বিতা। - মনুসংহিতা। ১।৪৯

[xiv] তস্লাৎ সুবহবো বৃক্ষা রোপ্যঃ শ্রেয়োহভিবাঞ্ছতা ।
পূত্রবৎ পরিপাল্যাশ্চ তো পুত্রা ধর্মতঃ স্মৃতাঃ - অগ্নিপুরাণ।

[xv] বৃক্ষাংশ্চিত্ত্বা পশূন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দমম্।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গে নরকং কেন গম্যতে।। -পঞ্চতন্ত্র-কাকোলুকীয়ম্ ১০৬।

[xvi] হংসঃ শুচিষদ্ বসুর্ অন্তরিক্ষসদ্ ধোতা

বেদষিদ্ অতিথির দুরোণ সৎ।
নৃষদ রবসদ্ ব্যোমসদ অজা গোজা
ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।। - কঠোপনিষদ্ ২/২/২

[xvii] 'পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিদৌঃ শান্তিরাপঃ
শান্তিরোষধয়য়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির'। অথর্ববেদ সংহিতা। ১৯/১৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ২০২২।
২. চক্রবর্তী, সোমনাথ। কথায় কর্মে এথিক্স। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। কলকাতা। ২০২০।
৩. সিঙ্গার, পিটার। প্র্যাকটিক্যাল এথিক্স। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। নিউ ইয়র্ক। ২০১১।
৪. ধর, বেনুলাল। ব্যবহারিক নীতিদর্শন। মিত্রম্। কলকাত। ২০১৭।
৫. রায়, প্রদীপ কুমার। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা। নয়া উদ্যোগ। কলকাতা। ২০১১।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তীর্থনাথ। বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্চালী। প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা। সঞ্জয় সামন্ত ও মুশায়েরা। কলকাতা। ২০১১।
৭. পাল, সন্তোষ কুমার। ফলিত নীতিশাস্ত্র। লেভান্ত বুকস্। কলকাতা। ২০২১।
৮. চক্রবর্তী, সোমনাথ। নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। কলকাতা। ২০২১।
৯. সিনহা, জাদুনাথ। এ মানুয়াল এথিক্স। নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি। কলকাতা। ২০০৯।